সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (বিশেষ বুলেটিন) ● ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ● দুই টাকা

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা চাই ॥ গুম-ক্রসফায়ার-রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও পেট্রোল বোমার সন্ত্রাস রুখে দাঁড়াও ॥ স্বৈরতান্ত্রিক একতরফা নির্বাচন জনগণ মানে না

ক্ষমতাকেন্দ্রিক হানাহানির অপরাজনীতি প্রত্যাখ্যান করুন

বাম গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

এদেশের মানুষের আজ কোনো স্বাভাবিক জীবন নেই। ঘর থেকে বের হলে নেই ঘরে ফেরার নিশ্চয়তা, অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা তারও ঠিক নেই। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে এসএসসি পরীক্ষা দেবে - পরদিন পরীক্ষা হবে কি না তা তারা আগের দিন জানে না। দিনমজুর-কৃষক-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের চলছে বাঁচা-মরার লড়াই। প্রতিটি দিন শুরু হচ্ছে সীমাহীন অনিশ্চয়তা দিয়ে। দুই দলের ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াইয়ের যুদ্ধক্ষেত্র এ দেশ। জনগণের কোনো স্বার্থ এতে নেই। আছে অশেষ যন্ত্রণাভোগ। যে ব্যবস্থার ভিত্তিতে দেশ চলছে সেই ব্যবস্থাটিই এসব ঘটনার পুনঃ পুনঃ জন্ম দিলেও বর্তমান সংকটের উৎপত্তি ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন থেকে। আওয়ামী লীগ একটা অবৈধ, ভোটারবিহীন, অগণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে ও জোরপূর্বক ক্ষমতায় টিকে থাকে। সেই থেকেই বর্তমান সংকটের শুরু। আওয়ামী লীগ এ সংকটের সূত্রপাত করেছে। আবার বিএনপি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সহিংসতার মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চাইছে। গণধিকৃত যুদ্ধাপরাধী শক্তি জামাতকে সে সাথে নিয়েছে। তারা নৃশংস সন্ত্রাস সংগঠিত করছে ও এই প্রক্রিয়ায়ই তাদের উপস্থিতি তুলে ধরছে। একদল বোমা মেরে-মানুষ হত্যা করে ক্ষমতায় যেতে চাইছে, অন্যদল সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে গুম-পুলিশি হেফাজতে খুন-নির্বিচার গ্রেফতার-বিনাবিচারে হত্যা করে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চাইছে। দুটোই ফ্যাসিস্ট শক্তি। তারা জনগণকে যুক্ত না করে সংঘাত ও সংঘর্ষের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে ও টিকে থাকতে চাইছে। এই দুই ফ্যাসিস্ট শক্তির কবল থেকে জনগণ মুক্তি চায়। মুক্তির পথ কী?

জনগণের মুক্তির বিভিন্ন রকম পথ যারাই দেখাচ্ছেন, তারা সবাই এই সমাজব্যবস্থার মধ্যেই সমাধান খুঁজছেন

দেশের সুশীল সমাজ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে দু'দলকে আলোচনায় বসার জন্য বলা হয়েছে। এটা একটা আপাত সমাধান। একটি গ্রহণযোগ্য ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে এ সমস্যার আপাত সমাধান হতে পারে। কিন্তু এরকম সংকট কেন হয় – এর ব্যাখ্যা তারা দিতে পারছেন না। তারা মনে করছেন, দুই নেত্রীর জেদাজেদিই এ ব্যবস্থার জন্য দায়ী। কিন্তু যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশ পরিচালিত হয়, সেই ব্যবস্থার মধ্যেই যে এই সংকটের কারণ নিহিত, ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে যে সংকট ঘুরে ফিরে বারবার আসতে থাকবে – সে কথা তারা তুলছেনই না। সুশীল সমাজের কথা আমরা বুঝতে পারি। তারা কেউ কেউ ব্যক্তিগত অর্থে সৎ মানুষ, কিন্তু সমাজ বিকাশের সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধারণ করেন না। আর কেউ কেউ সমাজ চালায় যে *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ রুখে দাঁড়াও। সাধারণ মানুষের উপর
হামলা বন্ধ কর। নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরী ক
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী

১৩ জানুয়ারি ঢাকায় বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিক্ষোভ

বাংলাদেশের বামপন্থীদের প্রতি আমাদের আহ্বান

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বাংলাদেশে একটা দুর্যোগ চলছে – দুই দলের ক্ষমতাকেন্দ্রিক হানাহানির রাজনীতির কারণে এ দুর্যোগ সৃষ্টি হয়েছে। গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতার গদি দখলে রাখা আর গদিতে আসীন হওয়ার যুদ্ধে জনগণকে জিম্মি করে এ সংকট তারাই তৈরি করেছে। এখানে জনগণের কোন স্বার্থ নেই। বুর্জোয়া দলগুলো, অর্থাৎ আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জামাত-জাতীয় পার্টি এবং তাদের সহযোগী অন্য শক্তিগুলো তো আর জনগণের কথা ভাবে না। এরা চূড়ান্ত দুর্নীতি-লুটপাট ও সুবিধাবাদিতার পঙ্কে নিমজ্জিত। তাই তাদের কাছ থেকে দেশের সচেতন মানুষ এখন আর কোনো কিছু আশাও করে না। বামপন্থীরা জনগণের কথা বলে, জনগণের জন্য রাজনীতি করে। তাদের অনেক ত্যাগ আছে, সততা আছে, দেশপ্রেম আছে, অতীতে অনেক লড়াই সংগ্রাম আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা তা তারা করতে পারছেন না কেন?

বামপন্থী বন্ধুরা কি করছেন?

দেশের এই ঘোর দুর্দিনে, জনগণের এই ভয়াবহ বিপদে বামপন্থীরা কি করছেন? সম্ভবত দেশের প্রতিটি বামপন্থী কর্মীকেই এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। বামপন্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই কিছু জবাব দিয়ে থাকেন। নিজেদের নানা কাজকর্মের, উদ্যোগের কথাগুলো তুলে ধরেন। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম যে কথাটা বলা দরকার তা হল, বাংলাদেশে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ কোনো অবস্থান নেই। এমন কোনো একটি যুক্তফ্রন্ট নেই যেখানে দেশের সক্রিয় সকল বামপন্থী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে জনজীবনের সংকট নিরসনের দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিক্ষোভ

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষায় সংগঠিত হোন

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও সাধারণ মানুষের ওপর হামলা বন্ধের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে ৩১ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মূল বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। ঢাকা মহানগর নেতা ফখ্‌রুদ্দিন কবির আতিক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য উজ্জ্বল রায়, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য জহিরুল ইসলাম। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন-গুলিস্তান এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

নোয়াখালী : ১০ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় জেলা শহর মাইজদীর টাউন হল মোড়ে প্রধান সড়কে মানববন্ধন-সমাবেশ কর্মসূচি পালন করা হয়। **সিলেট :** ১৩ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় শহরে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। একই দাবিতে ২৩ জানুয়ারি বিকাল ৩টায় মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। **গাইবান্ধা :** ১২ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। **রংপুর :** ১২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, সিও বাজার, মেডিকেল পূর্বগেট, বাহার কাছনায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া বগুড়া, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, জয়পুরহাট, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, ফেনী, চাঁদপুর সহ বিভিন্ন জেলায় কর্মসূচি পালিত হয়।

বাম গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পুঁজিপতিশ্রেণী তাদেরই পরামর্শদাতা, তাদের স্বার্থেই বিদ্যা-বুদ্ধি খরচ করেন। তাই তাদের বিষয়ে আমাদের বিশেষ বক্তব্য নেই। কিন্তু আমরা দুঃখ পাই যখন আমরা দেখি আমাদের বামপন্থী বন্ধুদের কেউ কেউ এরকম পরামর্শ দেন। যেন দু'দলকে মেলানোর দায়িত্ব বামপন্থীদের। সারা দেশের মানুষের কাছে যখন এই দুই দলের চরিত্র উন্মোচিত, তখন এই বামপন্থীরা তাদেরকে আলোচনায় বসার জন্য আল্টিমেটাম দেন, তারা যাতে দেশের কথা ভাবে তার জন্য অনুনয় বিনয় করেন, বৃথা আস্ফালনও করেন। আরেক দল বামপন্থী বন্ধু মনে করেন বর্তমান সংকটের সমাধান গণতান্ত্রিক সংবিধানের মধ্যেই নিহিত। তাদের আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলতে হয় – এই সংবিধান কায়েম করার জন্য তাদের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সংসদে যেতে হবে অথবা বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে হবে। দুটোর কোনোটাই এই সময়ের জন্য বাস্তবসম্মত কথা নয়। আর শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকলে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সংবিধানও জনগণের অধিকারের সুরক্ষা দিতে পারে না, কারণ আজকের যুগে বুর্জোয়ারা আর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধারণ করে না। গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে জনগণের রাস্তায় নামার কোন বিকল্প নেই – বামপন্থীদের আহ্বান ও প্রচেষ্টা হওয়া উচিত সেটাই।

দেশে এখন কি ধরনের গণতন্ত্র চলছে?

এ গণতন্ত্রকে আজ চেনা যায় না। যে দল একাত্তরে বলেছিল – 'এদেশের লোকেদের উপর শোষণ-নির্যাতন করা যাবে না, অত্যাচার করা চলবে না, দেশের লোকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চয়তা চাই, কিন্তু তা দেয়া হচ্ছে না, দাবি করলে গুলি চালানো হচ্ছে, এ অবস্থা মানা যায় না, সাতকোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখা যাবে না' – সেই দলই আজ কী পরিমাণ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। দেশের নিরাপত্তা রক্ষার দোহাই দিয়ে চলছে ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার, পালাতে গিয়ে ট্রাকচাপায় মৃত্যু ইত্যাদি নানা নামে বিনা বিচারে খুন। এ বছরের ৬ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি এই এক মাসের মধ্যেই পুলিশী হেফাজতে নিহত হয়েছেন ১৯ জন। আটকের পর পায়ে গুলি করে পঙ্গু করার অভিযোগ উঠছে। পাওয়া যাচ্ছে গুলিবিদ্ধ লাশ, স্বজনদের অভিযোগ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ধরে নিয়ে গিয়েছিল, পুলিশ দায়িত্ব অস্বীকার করছে। প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্য বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন যেকোন ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। বিজিবি প্রধান বলেছেন আত্মরক্ষার জন্য তার বাহিনী গুলি করতে পারবে। র‍্যাব প্রধানের প্রশ্ন – অস্ত্র কি হা ডু ডু খেলার জন্য? একজন মন্ত্রী বলেছেন 'দেখামাত্র গুলি' করতে হবে। কেউ বলছেন – অপরাধীদের এনকাউন্টারে দিতে হবে, কেউ বলছেন – তাদের ধরা হবে, জীবিত বা মৃত। মন্ত্রীসভার বৈঠকে ৬ বছর আগে করা 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন'-কে পুনরুজ্জীবিত করার কথা বলা হয়েছে। কারণ এতে দ্রুত বিচার শেষ করতে হয়, এই আইনে মামলা জামিন অযোগ্য, সন্ত্রাসের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন, এমনকি মৃত্যুদণ্ড – সুতরাং তা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই কার্যকরী। ফোনে আড়ি পাতা নিয়ে সারা বিশ্বে তোলপাড় হচ্ছে। একদিন এই বুর্জোয়ারাই মানুষের প্রাইভেসির কথা তুলেছিল। আজ তারাই কোনো প্রকার প্রাইভেসির তোয়াক্কা করছে না। বাংলালিকস নামে একটি সাইটে নিয়মিতই বিভিন্ন লোকের কথোপকথনের টেপ প্রকাশ করা হচ্ছে। সরকার তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। হয়তো তার পক্ষে যাচ্ছে এ কারণেই অথবা হয়তো তাদের ইন্ধনেই একাজ হচ্ছে। ফেইসবুকে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে লেখার জন্য জেলে পুরে দেয়া হচ্ছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য 'সম্প্রচার নীতিমালা' করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা একটা অনির্বাচিত সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ তালিকা চাইলে আরও বড় করা যাবে। অর্থাৎ একদিকে সবরকম গণতান্ত্রিক অধিকারের সংকোচন, আর অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ – এ ছাড়া আজকের দিনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আর কোনো পথ খোলা নেই। আবার স্বাধীনতার পর থেকে যে দলই ক্ষমতায় এসেছে তারাই বিচার ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, ব্যাপকভাবে দলীয়করণ করেছে। ফলে বিচার ব্যবস্থার আপেক্ষিক নিরপেক্ষ কোনো শক্তি নেই যার দ্বারা গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ রক্ষা পেতে পারে।

৪৪ বছর ধরে ক্ষমতায় যারাই এসেছে তারা শুধু এ ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষাকারী

স্বাধীনতার পর থেকে যে দলই ক্ষমতায় এসেছে, তারাই এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিপীড়ন, নির্যাতন ও জনগণকে সবরকম গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রক্রিয়া বহাল রেখেছে। ছাত্রদের উপর গুলি, বিনা বিচারে রাজনৈতিক হত্যা, সংবিধান সংশোধন করে কালো আইনসমূহকে ফিরিয়ে আনা, সব দল বিলুপ্ত করে একদলীয় শাসন কায়েম – এসব মানুষ দেশ স্বাধীন হওয়ার সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছে। এর কোনোটাই স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা ছিল না। অথচ বিপরীত কাণ্ডটাই ঘটে গেল। কারণ তখন পাকিস্তানিদের তাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তাদের দল আওয়ামী লীগ এসব কথা মেনে নিলেও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর তা মানার আর কোনো দরকার ছিল না। এরপর অনেক ক্যু পাল্টা ক্যু হয়েছে, অনেকেই ক্ষমতায় এসেছে গেছে – কিন্তু সামগ্রিক ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতা যেটা আছে সেটাতো গোটা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে অস্থিরতা সব সময় বিরাজ করে, যেটা সারা বিশ্বেই এ যুগে সবচেয়ে বেশি, বাংলাদেশ একটি পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশ হওয়ার কারণে আরও বেশি। বাংলাদেশে পুঁজিবাদীরা অর্থনীতির উপযুক্ত করে তার উপরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি। তাই এখানে একদিকে যেমন অর্থনীতিতে অস্থিরতা বিরাজ করে, অন্যদিকে তেমনি তার উপরিকাঠামো অর্থাৎ রাজনীতিতেও অস্থিরতা বিরাজ করে। কিন্তু সবকিছুর পরও পুঁজিপতিদের সম্পদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া, জনগণের ক্রমাগত নিঃস্ব হয়ে যাওয়া, জমি হারানো, সরকার কর্তৃক পুঁজিপতিদের একচেটিয়া মুনাফার ব্যবস্থা করে দেয়া – প্রত্যেকটি সরকারের আমলে তা বহাল ছিল। একথা ভাববার কোন অবকাশ নেই যে, কোনো সরকার বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত বলে জনগণ কষ্টে ছিল, আরেকটা সরকার ভাল ছিল বলে জনগণ ভাল থেকেছে – এমনটি কখনও ঘটেনি। কেন ঘটল না? কেউই ভাল ছিল না বলে? এমন অনেককেই বলতে শোনা যায়, 'না ভাই, এই দেশের কিছু হবে না। সবাই খারাপ।' এরকম করে বোঝা কোনোরকম যুক্তির ভিত্তিতে বোঝা না। হতাশা থেকে উদ্ভূত কিছু কথা। আসলে দেশটা যে ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে তাতে পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ ব্যক্তিকে দেশের প্রধান করলেও মানুষের ভাগ্য পাল্টাবে না। গোটা দেশের মানুষকে শোষণ করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ধনী হবে, তারাই দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে, ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তিতেই এদেশের অর্থনীতি চলবে – এটাই হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এখানে দেশের প্রধান একজন সৎ লোককে করে দিলে সে নিজে অনৈতিক উপায়ে টাকা-পয়সা না খেতে পারে, কিন্তু ব্যাপক লুটপাট-দুর্নীতিতে সম্মতি দেয়া ছাড়া সে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে টেকাতে পারে না। ফলে সে সৎ থাকতেও পারে না। সৎ মানুষ থাকতে হলে সে মানুষ হওয়ার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে সৎ মানুষ তৈরির কোনো পথ নেই। আবার ব্যক্তিগত অর্থে সৎ মানুষ দিয়ে এ ব্যবস্থার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যে দুর্নীতি-লুটপাট, তাকে পাল্টাবারও কোনো উপায় নেই।

জনগণ নয়, বড় বড় শিল্পপতিদের সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে

স্বাধীনতার পর থেকে যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে, সেই ক্ষমতা ছেড়ে যেতে চায়নি। প্রত্যেকটি সরকারই অগণতান্ত্রিকভাবে, জোরপূর্বক ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে। সামরিক সরকার তো বটেই, এরশাদ সরকারের পতন ঘটিয়ে অনেক রক্তের বিনিময়ে যে গণতন্ত্র অর্জিত হলো, ক্ষমতায় আসলো বিএনপি সরকার, সে এসেও আন্দোলনের তাপের মধ্যেই সাজানো নির্বাচন করতে চেয়েছে। সেই থেকে শুরু করে যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে, সবাই যে কোনপ্রকারে অগণতান্ত্রিকভাবে হলেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু কেউই পারেনি। তাদের ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে জনগণের বিক্ষোভের কারণে। কিন্তু এবার ব্যতিক্রম। আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসেছে। এতে তারা জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করেনি, শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য নামেমাত্র ভোট হয়েছে। এ কাজটা তারা করতে পারলো বাংলাদেশের বড় বিজনেস্ গ্রুপগুলোর সমর্থনের কারণে। বাংলাদেশ সবচেয়ে সস্তা শ্রমের বাজার। সারা বিশ্বে ব্যবসায় মন্দা চলছে। মাল্টিন্যাশনালরা সস্তা শ্রম যেখানে, সেখানে ছুটছে। সেকারণে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানীতে চীনকে টপকে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এরকম বহু ফাটকা ব্যবসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এদেশের ব্যবসায়ীদের সামনে। মাল্টিন্যাশনালদের সাথে কোলাবরেশনে বিপুল মুনাফার সম্ভাবনা উঁকি মারছে দ্বারে। পুঁজিপতিদের লাভ মানেই শ্রমিকদের বিরামহীন দুর্দশা। দুর্দশা জনগণের, কারণ সমস্ত রকম সুবিধা পুঁজিপতিদের দিতে গিয়ে তাদের উপর ভয়াবহ নিপীড়ন নামিয়ে আনা হয়। এটাকে শক্ত হাতে মোকাবেলা করার মতো নির্ভরযোগ্য দল আওয়ামী লীগের মতো আর কেউ নেই। তারাও পুঁজিপতিদের সমস্ত প্রকারের সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফলে পুঁজিপতিশ্রেণী তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তার সমস্ত প্রচার-প্রপাগাণ্ডা কিছুটা সমালোচনা করলেও মূলতঃ এ সরকারের পক্ষেই। সমস্ত দমন-পীড়ন চললেও সমস্যা নেই, ব্যবসা চললেই হলো। তাই এত অত্যাচার চললেও ব্যবসায়ী নেতারা বিগত বছর নিয়ে খুব খুশি। তাদের মতে এই সময়কালে এরকম একটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বছর আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিএনপি-জামাত এ কী ধরনের আন্দোলন করছে?

বিএনপি পুঁজিপতিশ্রেণীরই একটি দল। কারও মনে যদি কোন সন্দেহ পূর্বে থেকেও থাকে যে, 'না, বিএনপি শুধু পুঁজিপতিদের স্বার্থই দেখে না, সে মানুষের কথাও চিন্তা করে' – এ ক'দিনের কর্মকাণ্ড দেখে নিশ্চয় তাদেরও ভুল ভেঙ্গেছে। দেখুন কত বড় দল বিএনপি। কত তার কর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী। দু'বার রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা দল। কিন্তু এখন তার রাস্তায় বের হওয়ার লোক নেই। বিএনপির এ সময়কার আন্দোলনের এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য – এখানে জনগণকে সংযুক্ত করার কোনো প্রশ্ন নেই, বরং জনগণকে ভয় দেখানো, আতঙ্ক সৃষ্টি করাই আন্দোলনের ফর্ম। তাদের এতবড় যোগাযোগের কেউ জনগণের এত এত সমস্যা যে এই সরকার তৈরি করছে, এত নিপীড়ন করছে – তার বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন সংগঠিত করেনি। তাদের কষ্ট একটিই – তারা ক্ষমতার বাইরে। তাদের দাবি একটিই – সরকারের পতন। অর্থাৎ জনগণের সমস্যা নিয়ে কথা বললে, মিছিল করলে, আন্দোলন করলে তা শেষ পর্যন্ত এ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যায়, পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে যায়। তাই তারা এর ধার দিয়েও যাবে না। তারা অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক শক্তি জামাতকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এবং সাম্প্রদায়িক পরিবেশ তৈরি করছে।

শেষ পর্যন্ত লাভ কার হচ্ছে

অব্যাহত রাজনৈতিক সহিংসতায় ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কত হচ্ছে দেখাতে সব টিভি-পত্রিকা প্রতিযোগিতায় নেমেছে। প্রতিদিন হিসেব বের করা হচ্ছে। অথচ আমরা জানি সরকার বাহাদুর তাদের লোক। তিনি অচিরেই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের লোকসান পুষিয়ে দেবেন। এমনটি তারা আগেও দিয়েছেন। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন পূর্ববর্তী সংঘাতে তাদের লোকসান পুষিয়ে দেয়ার জন্য রাষ্ট্র থেকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যারা এই সংঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে – তারা কারা? তারা হলো দেশের খেটে খাওয়া মানুষ। সে গ্রামের কৃষক। শহরের দিনমজুর, রিকশাচালক, সিএনজি চালক। তারা ফুটপাতে কাপড় বিক্রি করে, মনোহারী জিনিস বিক্রি করে পেট চালায়। টানা অবরোধে তাদেরই ত্রাহি ত্রাহি রব। কৃষক তার উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে না পেরে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। সর্বস্বান্ত কৃষকের জমি বিক্রি করে শহরে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু জমি কিনবে কে? গ্রামের সকল জমি মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রিভূত হচ্ছে। আবার জমি বিক্রি করে শহরে আসা লোকেরা কাজ করবে কোথায়? তাদেরকে দিয়ে আরও সস্তায় কাজ আদায় করিয়ে নেবেন এই কারখানা মালিকেরাই। তাই ক্ষতি তাদের নেই। টানা অবরোধে ক্ষতির যত মায়াকান্নাই তারা কাঁদুন না কেন – আসলে শেষ বিচারে তাদের লাভই হয়।

তাহলে পথ কী?

এ থেকে বাঁচার উপায় কী? এই সমস্যার আপাত সমাধানের জন্য সকলের অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দরকার ও তার জন্য বাম গণতান্ত্রিক শক্তি ও দেশপ্রেমিক মানুষের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে, একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। কিন্তু এতেই পুরো সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ সমাজটা শ্রেণীবিভক্ত, একদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণী, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। দু'শ্রেণীর স্বার্থ এক নয়, লাভ-লোকসান এক নয়, ভাল-মন্দের ধারণা এক নয়, গণতন্ত্রও এক নয়। আমাদের দেশে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে তারা এ দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর পলিটিক্যাল ম্যানেজার মাত্র। শিল্পপতিরা তাদের ফ্যাক্টরি চালানোর জন্য যেমন ম্যানেজার নিয়োগ করে, তেমনি দেশ চালানোর জন্যও তারা ম্যানেজার নিয়োগ করে। সরকার হলো তাদের সেই পলিটিক্যাল ম্যানেজার। শুধু একটা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল হলেই দেশে শান্তি আসবে না, সাধারণ মানুষের দুঃখ ঘুচবে না, রুটি-রুজির প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। কারণ এতে শুধু ম্যানেজার পাল্টাবে, মালিকদের হাত থেকে রাষ্ট্রটা শ্রমিকদের হাতে যাবে না। নতুন ম্যানেজার মালিকের কথামতোই চলবে। এ থেকে মুক্তির পথ একটাই – খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের নিজেদের শক্তি গড়ে তোলা। নিজের শ্রেণীর মুক্তির জন্য, রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় গণআন্দোলন গড়ে তোলা। এজন্য পাড়ায়-মহল্লায়-এলাকাতে সকল রকম গণবিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলা দরকার। তাই শিক্ষা-স্বাস্থ্য-নারী নির্যাতনসহ সকল সংকটকে কেন্দ্র করে এলাকায় এলাকায় শিক্ষিত-সচেতন-বিবেকসম্পন্ন মানুষরা এগিয়ে আসুন, জনগণকে সাথে নিয়ে রুখে দাঁড়ান। বাম গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন। মানুষকে সংঘবদ্ধ করুন। দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার বিকল্প শক্তি সৃষ্টি করুন। একমাত্র এ পথেই এ নির্মম শোষণের জোয়াল কাঁধ থেকে নামতে পারে।

গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল, আলু-ধান-ভুট্টাসহ কৃষি ফসলের নায্যমূল্য নিশ্চিত করা, মাদক-জুয়া-অশ্লীলতা বন্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাসহ ১০ দফা দাবীতে বাসদ (মার্কসবাদী) দিনাজপুর জেলা শাখা ২৮ জানুয়ারি ১১টায় জেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। দিনাজপুর প্রেসক্লাব থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে এসে প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ জানুয়ারির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ সফল করার জন্য বাসদ (মার্কসবাদী) গোটা জেলায় মাসব্যাপী মিছিল, ৩০টি হাটসভা ও পথসভা অনুষ্ঠিত করে।

রংপুর : বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২৮ জানুয়ারি নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও কাচারী বাজার চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জয়পুরহাট : বাসদ (মার্কসবাদী) জয়পুরহাট জেলা শাখার উদ্যেগে গত ২৩ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলার দুর্গাদহ বাজার, পুরানাপৈল বাজার, কুঠিবাড়ী ব্রীজ, মঙ্গলবাড়ী, ক্ষেতলাল উপজেলার করিমপুর ত্রিমুণি ক্ষেতলাল সদর, চৌমুহিনি বাজারে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের বামপন্থীদের কাছে আমাদের আবেদন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) তোলার লক্ষ্যে কাজ করছেন। বামপন্থীদের একাংশ আছেন সরকারের সাথে। মহাজোট সরকারের গণবিরোধী অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের শরীক হয়ে তারা বামপন্থী চরিত্র হারিয়েছেন। আরেক অংশ দ্বি-দলীয় বৃত্তের বাইরে বিকল্প গড়ার স্লোগান দিলেও ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকারের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তাদের জোরালো অবস্থান দেখা যায় না। জনগণের মূল শত্রু ক্ষমতাসীন শাসকদের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখানোর রণকৌশল তাদের অনেক সময়ই সরকারি পরিকল্পনার সহযোগী ভূমিকায় ঠেলে দেয়। এই দুই অংশের ভূমিকায় বামপন্থীদের অবস্থান নিয়ে জনমনে প্রবল বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এর বাইরে যে বামপন্থীরা তারা সাংগঠনিক শক্তিতে দুর্বল। তাদের মধ্যে অনেকে যুক্ত আন্দোলনে থাকলেও সর্বোচ্চ বোঝাপড়া ও সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলনের পরিকল্পনা নেই।

বামপন্থীদের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যের মধ্যেই তাদের শক্তি নিহিত আছে। কারণ অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল, অর্থাৎ পুঁজিপতিদের-বড়লোকদের-লুটপাটকারীদের পক্ষের যে রাজনৈতিক দলগুলি, তারা জনগণের প্রতিদিনের যে সমস্যা অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বেকার সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে কোনো লড়াই করছে না। তারা শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল, ক্ষমতার ভাগাভাগি এবং অর্থনীতিতে লুটপাটেরও যে একটা প্রতিযোগিতা চলছে – সেই প্রতিযোগিতার মধ্যেই লিপ্ত একটি রাজনৈতিক দল মাত্র। তাই এ অবস্থা থেকে জনগণকে পথ দেখানোর ক্ষমতা একমাত্র বামপন্থীদেরই আছে। সকল বামপন্থী দলেরই সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এর মধ্যে একটি ভূমিকা আছে জনগণের পক্ষে। সেটি হলো, যে অধিকারগুলো রাষ্ট্র জনগণকে দেয়নি সেগুলোকে কেন্দ্র করে সর্বোচ্চ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচি নির্ধারণ করে আন্দোলন গড়ে তোলা।

কীভাবে বামপন্থীরা সম-স্বার্থবোধ তৈরি করতে পারে, যাকে ভিত্তি করে সম-উদ্দেশ্য নিয়ে ‘বামপন্থী’ হিসাবে সবাই একই লক্ষ্যে কাজ করতে পারে? কীভাবে নিজেদের দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে? সম-স্বার্থ বামপন্থীদের আছে, সেটা জনগণের স্বার্থের মধ্যে। জনগণের স্বার্থ অর্থাৎ জনজীবনের এ মুহূর্তের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো নিয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনার ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচি নির্ধারণ এবং সে কর্মসূচি অনুযায়ী জনগণকে সংগঠিত করা ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বামপন্থীদের মধ্যে সমস্বার্থবোধ তৈরি হতে পারে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এ বিষয়টিকে যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন হিসাবে বিবেচিত হয়। দুনিয়ার ইতিহাসে যেখানেই সফল বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, রাশিয়া কিংবা চীনে, সর্বত্রই কমিউনিস্টদেরকে, বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচি ও সর্বোচ্চ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

বাংলাদেশের বাম আন্দোলনের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে এদেশে বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কখনোই গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। গণআন্দোলন হয়েছে, কিন্তু সেগুলো হয়েছে এখানকার বুর্জোয়াশ্রেণীর আশু উদ্দেশ্য পূরণের প্রয়োজন থেকে, বামপন্থীরা সেগুলোকেই অনুসরণ করেছেন। এসব দাবির মধ্যে জনগণের দাবিও ছিল, কিন্তু সেটাকে বামপন্থীরা স্বাতন্ত্র্য দিতে পারেনি, গণআন্দোলনের ইস্যু হিসাবে প্রাধান্যে আনতে পারেননি। তাই স্বাধীনতার পর আজ অবধি এখানে নাগরিক জীবনের সমস্যা সংকট নিয়ে, কৃষকের দাবি নিয়ে, শ্রমিকের দাবি নিয়ে কোনো দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায়নি। বিভিন্ন সমস্যার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়া জানানো, নিজেদের মধ্যে সংকীর্ণ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রচার-সর্বস্ব কার্যক্রমের চক্রে বামপন্থী শক্তিগুলো ঘুরপাক খেয়েছেন। এটা বামপন্থীদের চরম ব্যর্থতা ও দুর্বলতা।

গণআন্দোলন দূরে থাক, যতটুকু বিক্ষোভ দেশের মানুষের মনে জমা হয়ে আছে তা বেরুবার রাস্তা পর্যন্ত বামপন্থীরা তৈরি করতে পারছেন না। এত সংকট চারপাশে – ক্ষমতা দখলে রাখার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনৈতিক সন্ত্রাস, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সমস্যা। শুধু এক স্কুল শিক্ষায় পরীক্ষা আর প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে যে ভয়াবহ সংকট তৈরি হয়েছে তার উৎপাতেই তো বাবা-মায়েদেরর জান জেরবার হয়ে গেল। এগুলো নিয়ে কর্মসূচি ঘোষণা করে বামপন্থী শক্তিকে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলা উচিত – “আসুন, রাস্তায় নামুন। এ অত্যাচার সহ্য করবেন না। নীরবে প্রতিবাদহীনভাবে সহ্য করতে থাকলে আপনাদের উপর আরো দুর্ভোগ-দুর্যোগ নেমে আসবে। আর এভাবে অন্যায় মেনে নিলে, অত্যাচার সহ্য করলে মনুষ্যত্ব থাকবে না।” অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য এই প্রাথমিক কাজ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে বামপন্থীদের দ্বারা হয়নি।

বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত থাকবে, আলাদা রাজনৈতিক লাইনও থাকবে। কিন্তু জনজীবনের সংকটগুলো নির্দিষ্ট করে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নেমে আসা দরকার। গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ যারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছেন তাদেরকে যুক্ত করে দীর্ঘমেয়াদী প্রচার-প্রচারণা-বিক্ষোভ সংগঠিত করা দরকার। সকল রকম দলীয় সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে, জনগণের সমস্যা সংকট নিয়ে সর্বোচ্চ বোঝাপড়া ও সর্বস্মত ন্যূনতম কর্মসূচি-ভিত্তিক ঐক্যের ভিত্তিতে বামপন্থীদের গণআন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত নিয়ে মতবিনিময় হবে, আদর্শগত সংগ্রাম হবে। ‘ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য’র ভিত্তিতেই তার সমাধান হবে।

জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও শক্তিশালী করা ছাড়া বামপন্থীরা শক্তিশালী হতে পারবেন না

বামপন্থীরা দুর্বল, এটা প্রায়শই শোনা যায়, এবং এটা অনেক দিক থেকেই সত্য। তাহলে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধির পথ কি? একমাত্র ধারাবাহিক ও দীর্ঘমেয়াদী গণআন্দোলন গণসংগ্রামের পথেই জনগণের শক্তি হিসাবে বামপন্থীরা দাঁড়াতে পারে। এবং এর ভিতর দিয়ে জনগণের অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব আন্দোলনকারী সংস্থা ও প্রতিরোধের শক্তিও তৈরি হয়। জনগণের দাবি নিয়ে, বুর্জোয়া শাসনের ফলে জনজীবনের উপর চেপে বসা সমস্যাগুলো নিয়ে, বুর্জোয়া শাসনের মাধ্যমে হরণ করা গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারগুলো (সিভিল রাইটস) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবি নিয়ে লড়তে লড়তেই বামপন্থীদের পক্ষে এবং বিশেষভাবে বিপ্লবী শক্তির পক্ষে শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো ও গণভিত্তি তৈরি করা সম্ভব। ধারাবাহিক গণআন্দোলনের কষ্টকর পথ এড়িয়ে গিয়ে কোনো দেশেই বামপন্থীরা শক্তি অর্জন করতে পারেনি, এমনকি ভোটের রাজনীতিতেও বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। এ হল ইতিহাসের শিক্ষা। এই গণআন্দোলনের পথে এলাকায় এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করার মধ্য দিয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এই সংগ্রাম কমিটি কিন্তু বামপন্থী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের কমিটি নয়। ভুক্তভোগী জনগণের কমিটি, সেখানে বামপন্থীরাও থাকবেন। যেমন, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও স্কুল শিক্ষা ধ্বংসের বিরুদ্ধে পাড়ায় মহল্লায় স্কুলে স্কুলে অভিভাবক সংগ্রাম কমিটি বা বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগ্রাম কমিটি। এমনি ভাবে প্রতিটি সমস্যা নিয়ে ভুক্তভোগী জনগণের সংগ্রাম কমিটির জাল সারা দেশে তৈরি করতে হবে।

বুর্জোয়া রাজনীতির সংকটের চক্রে জনগণকে আটকে রাখার চক্রান্ত প্রত্যাখ্যান করে গণআন্দোলনের পথে এগিয়ে আসুন

গরিব-মধ্যবিত্তের জীবনে আর্থিক সংকট যেভাবে বাড়ছে তাতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রধান ইস্যু হওয়ার কথা ছিল মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধি, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, কৃষকের ফসলের দাম না পাওয়া, দারিদ্র্য-বেকারত্ব, গ্রামীণ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সারাবছরের কাজ, সন্ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতা, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ইত্যাদি। কিন্তু বুর্জোয়া দলগুলোর সাংগঠনিক জাল ও প্রচারমাধ্যমের দৌলতে তাদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক কোন্দল এমনভাবে জনমনে প্রভাব বিস্তার করে যাতে জনগণের সমস্যা চাপা পড়ে যায়। এমনকি গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উন্নয়ন ইত্যাদি যেসব কথা বলে শাসকদল আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রশক্তির জোরে ক্ষমতা দখল করে রাখতে চাইছে সেগুলোও যে তারা বিশ্বাস করে না, এটাও দেশবাসী খুব ভালো করেই জানেন। যে বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার রক্ষার কথা বলে দিনের পর দিন হরতাল-অবরোধ দিয়ে আন্দোলনের ভান করছে তারাও যে বিন্দুমাত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করে না, সেটাও মানুষ জানে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মননজগতে এমন ধারণা তৈরি করা হয়েছে এই বড় দলগুলো ছাড়া তারা উপায়হীন।

অথচ সারা দুনিয়ার ইতিহাস, বিশেষত আরব বিশ্বের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে জনগণ কি বিরাট শক্তি ধরে। যদিও এর দুর্বলতার দিকটাও আমরা বারবার দেখিয়েছি। এই বিশেষ দুর্বলতার পরও জনগণের আন্দোলন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, গণঅভ্যুত্থানকে বুর্জোয়ারা সাংঘাতিক ভয় পায়। জনগণ রাজপথে নেমে আসুক এটা তারা কোনোভাবেই চায় না। যে কারণে বর্তমানে বাংলাদেশেও আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে নিয়ে কোনো ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার পথে বিএনপি হাঁটছে না। এমনকি বাংলাদেশের গত ৪৩ বছরের ইতিহাস ছেঁকে দেখুন, জনগণের প্রত্যক্ষ সমস্যা ও দাবি-দাওয়া নিয়ে বুর্জোয়া দলগুলোর কোনো ধরনের আন্দোলন সংগ্রামের নজির খুঁজে বের করতে পারবেন না। বরং ক্ষমতাসীন শাসকরা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোর উপর যত ধরনের আক্রমণ নামিয়ে আনছে, বিএনপি মুখে মুখে যত কথাই বলুক সেগুলোর বিরুদ্ধে কোনো জানবাজি লড়াই করছে না। কারণ নিপীড়নের এসব স্বৈরতান্ত্রিক হাতিয়ার ভবিষ্যতে প্রয়োগ করবার বাসনা ওরাও পোষণ করে। এরা বড়জোর মাঝে মাঝে বিরাট শো-ডাউন বা জমায়েতের প্রদর্শনী করবে, কিন্তু জনগণকে যুক্ত করে সত্যিকার আন্দোলনের পথে পা ফেলবে না। এই রোগ আমাদের অনেক বামপন্থী বন্ধুর ঘাড়েও ভর করেছে। অথচ বামপন্থীদের করণীয় হওয়া উচিত সরকারের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন তৈরির মধ্য দিয়ে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে সরকারকে বাধ্য করা।

বামপন্থীদের দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি-বিভক্তি যাই থাকুক, জনগণের একমাত্র মিত্র তারাই। জনগণের ভরসাও তারাই। দুটি ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক শক্তি এই নিপীড়নমূলক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেশে তৈরি করে রেখেছে, তার হাত থেকে মুক্ত হতে গেলে বামপন্থীদের সঠিক চেতনার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সর্বোচ্চ বোঝাপড়া ও সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে এলাকায় এলাকায়, থানায় থানায়, গ্রামে গ্রামে সর্বনিম্ন স্তর থেকে জনগণকে সংগঠিত করে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলতে হবে। তবেই বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি মিলবে। এই আবেদনই আমরা বাম আন্দোলনের প্রতিটি নেতাকর্মী এবং দেশবাসীর সামনে রাখছি। তা না হলে ঘুরে ফিরে বুর্জোয়াদের হাতে দলিত-পীড়িত-শোষিত হওয়ার পথ থেকে জনগণের মুক্তি নেই।

[৩১ জানুয়ারি শনিবার বিকালে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর প্রদত্ত বক্তব্যের একাংশ সম্পাদিত করে এখানে প্রকাশ করা হল।]

‘লালফৌজই আমাদের মুক্তিদাতা’

আসউইজ ক্যাম্প মুক্ত হওয়ার ৭০ বছর পূর্তিতে বললেন সেদিনের এক বন্দি

পোল্যান্ডের আসউইজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। নাৎসী বাহিনীর ভয়াবহ নৃশংসতার সাক্ষী এই ক্যাম্পটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসী বাহিনী এই ক্যাম্পেই ১১ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করে। ১৯৪৫ সালের ২৭ জানুয়ারি এই ক্যাম্পে যখন লালফৌজের ৩২২তম রাইফেল ডিভিশন প্রবেশ করে, তখন শত শত মৃতদেহ পড়ে আছে মেঝেতে, সাড়ে সাত হাজার বন্দি মৃত্যুর প্রহর গুণছে। তারা জানত, তাদের বাঁচার আর কোনো পথ খোলা নেই। শুধু কখন মরবে, এর অপেক্ষামাত্র।

কিন্তু লালফৌজ তাদের জীবন দিল। আসউইজ ক্যাম্প যখন লালফৌজ মুক্ত করে তখন এর সাড়ে সাত হাজার বন্দি আবেগে আপ্লুত, আনন্দে বিহ্বল। এরা কারা এই মৃত্যুপুরীতে জীবনের বার্তা নিয়ে এলো? এ যেন রূপকথা!

আবেগে মথিত লালফৌজও। সেদিন পলা লেভোবিকসের বয়স ছিল ১১ বছর। এক কিশোরী বন্দি। সে জানত সে আর বড় হবে না। কৈশোরেই নিভে যাবে তার জীবনপ্রদীপ।

কিন্তু জীবন তার সেদিন শেষ হয়নি। আজ তার বয়স ৮১ বছর। থাকেন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়। তিনি সেদিনের সেই স্মৃতি স্মরণ করে বলছেন, “লালফৌজ সেদিন আমাদের সবাইকে জীবন দিয়েছিল। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ক্যাম্প মুক্ত করার পর আমাকে এক লালফৌজ সৈনিক কোলে তুলে নিল এবং জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো।”

পলা কথাটা যে প্রসঙ্গে বলেছিলেন তা হলো এ বছরের ২৭ জানুয়ারি আসউইজ ক্যাম্প মুক্তির ৭০ বছর উদযাপিত হয়েছে পোল্যান্ডে। কিন্তু সেখানে কোনো রাশিয়ানকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। অথচ এই ক্যাম্প মুক্ত করে হাজার হাজার মানুষকে নবজীবন দিয়েছিল তারাই। পলা সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার সময় বললেন, “তাদের (রাশিয়ানদের) অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ তারাই আমাদের মুক্তিদাতা।”

পার্বত্য চট্টগ্রামে জারি করা সকল অগণতান্ত্রিক বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করুন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাথে দেশি-বিদেশি নাগরিকদের সভা করা ও কথা বলা, বিদেশিদের ভ্রমণ ও চলাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, আদিবাসী পুলিশ ও আনসার সদস্যদের অন্যত্র বদলির বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে জারি করা নির্দেশনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে এসব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘বিগত ৪ দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান নিপীড়ন ও বৈষম্যের পরিস্থিতি অবসানে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসহ দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি যখন সোচ্চার তখন একে উপেক্ষা করে এ ধরনের পদক্ষেপ সরকারের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। এটা পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে দেশবাসীর স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ। এর উদ্দেশ্য পাহাড়ি জনগণকে দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাম্প্রদায়িক প্রচারণার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে দমনমূলক সেনাশাসন আরো সুদৃঢ় করা।’

তিনি পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি সমস্যার সমাধান, সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, সকল হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনার বিচার, সাম্প্রদায়িক উসকানি বন্ধসহ পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবিতে সকল গণতান্ত্রিক শক্তিসহ শোষিত জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শার্লি এবদোর ওপর হামলার পেছনে কারা

প্রশ্ন তুললেন ফ্রান্সের বামপন্থীরা

প্যারিসের কার্টুন পত্রিকা শার্লি এবদোর দফতরে ৭ জানুয়ারি সন্ত্রাসীরা হানাদারি চালিয়ে খুন করেছে ১২ জন মানুষকে। এ প্রসঙ্গে ফ্রান্সের ‘পোল অফ কমিউনিস্ট রিভাইভাল ইন ফ্রান্স’ (পিআরসিএফ – ফ্রান্সে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত বামপন্থীদের সংগঠন) নিচের বিবৃতিটি প্রকাশ করেছে। ফ্রান্সেরই অপর একটি সংগঠন ‘কমিউনিসটেস’ প্রায় একই বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

যেন মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে উঠে এসে সন্ত্রাসবাদীরা নিরস্ত্র মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। হতবুদ্ধি সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। ১২ জন নিহত, অনেকেই গুরুতর আহত। নিহতদের ঘনিষ্ঠজনদের যন্ত্রণা ও ঘৃণার শরিক আমরা। সমস্ত ধর্মের নাগরিক, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার জয়গান করেন, চার্চের ভীতি ও সন্ত্রাস থেকে মানুষকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে একসময় ঈশ্বরনিন্দাকে আপরাধ হিসেবে গণ্য করার যে আইনটি বাতিল হয়েছিল, তা ফিরিয়ে আনার দাবির বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিল যাঁরা, তাঁদের সকলের দুঃখ ব্যথার আমরা শরিক। এই হামলায় যাঁরা নিহত হলেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা।

পিআরসিএফ এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানায়। এইসব হত্যাকারী ও তাদের দীক্ষাগুরু, যাদের কোনওমতেই ক্ষমা করা যায় না, তাদের প্রতি রইল তীব্র ঘৃণা।

এরপর সমস্ত ঘৃণাবোধের ঊর্ধ্বে উঠে ঠাণ্ডা মাথায় আমরা এই ঘটনার বিশ্লেষণ করেছি এবং নিজেদের কাছে প্রশ্ন রেখেছি, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কী আছে। এখনও পর্যন্ত হত্যাকারীরা কারা সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। তা সত্ত্বেও ফ্রান্সের ন্যাশনাল ফ্রন্ট পার্টির নেতা মারিন লে পেন এই হত্যাকাণ্ডকে ইসলামি মৌলবাদীদের হামলা বলে নিন্দা করেছেন। এই অনুমানটিকে আপাতভাবে যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও, এটা কিন্তু অনুমান ছাড়া কিছু নয়। এবং ন্যাশনাল ফ্রন্টের এই মন্তব্যের মধ্যে প্ররোচনা আছে। তাদের আশা, এই অনুমান প্রচার পেলে তাদের বিদেশাতঙ্ক ছড়ানোর কার্যক্রম গতি পাবে।

ধর্মীয় মৌলবাদীদেরই যে শুধু সন্ত্রাস ছড়ানোর একচেটিয়া অধিকার আছে, তা নয়। ইসলামি মৌলবাদীদের কথাই যদি ধরা হয়, কারা তাদের উৎসাহ জোগাল? কারাই বা তাদের অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে? কারা তাদের সমর্থন করছে?

এ কাজ করছে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলি, যেমন – সৌদিআরব, কাতার এবং যুদ্ধ জোট ন্যাটোর অনুগত আরব দেশগুলো। এরাই আরবের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে, সেখানকার শ্রমিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে ভাঙতে কাজে লাগিয়েছে এসব মৌলবাদীদের। আফগানিস্তানের নির্বাচিত সরকার আন্তর্জাতিক বিধি মেনে যে লালফৌজকে সাহায্যের জন্য ডেকে এনেছিল, তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে মদত দিয়েছিল। মনে রাখা দরকার, মিশরের আনোয়ার সাদাত নিজের দেশের প্রগতিশীল মানুষদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন মুসলিম ব্রাদারহুডকে। আজও সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীন ও সার্বভৌম সিরিয়ার বিরুদ্ধে আইএসআইএস-কে অস্ত্র ও অর্থ জুগিয়ে চলেছে। একথা মনে রাখা দরকার, লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানকে কারা নৃশংসভাবে খুন করে দেশটিকে মৌলবাদী ধর্মান্ধদের হাতে তুলে দিয়েছে। এরা হলো ফ্রান্সের তৎকালীন প্রধান সারকোজি, বৃটেনের ক্যামেরন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওবামা।

বাস্তবে, ইসলামী মৌলবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি, যা অনেক সময় নিজের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে যায়। আনোয়ার সাদাতকে মুসলিম ব্রাদারহুডের হাতেই মরতে হয়েছিল। আফগানিস্তানের হাজার হাজার ছাত্র, কমিউনিস্ট কর্মী ও শিক্ষকদের হত্যা করার পর তালিবানরা পশ্চিমী দেশগুলির দিকেই তাদের অস্ত্রের মুখ ঘুরিয়ে ধরেছে, তারা ধ্বংস করেছে আমেরিকার টুইন টাওয়ার।

এইসব জঘন্য অপরাধ থেকে কারা সুবিধা পায়? এটাকেও অবশ্যই আলোচনার বিষয় করা উচিত। কোন্ সেই রাজনৈতিক শক্তি যারা আরববিরোধী জাতিবিদ্বেষ মদত দিচ্ছে? কারা শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তবতাকে সরিয়ে সেই জায়গায় জাত-পাত-ধর্মের লড়াইকে সামনে আনতে চাইছে? এরা হলো উন্মত্ত ফ্যাসিবাদী শক্তি, যাদের মধ্যে আছে দক্ষিণপন্থীরা যারা ছদ্ম বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন নিয়ে ফ্রান্সের ন্যাশনাল ফ্রন্টের জাতি-ধর্ম বিদ্বেষী প্রচারের শরিক হচ্ছে।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের বিরুদ্ধে নিন্দা ছড়ানোর ফলে খেটে খাওয়া সাধারণ মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে অনেকে।

এ জিনিস অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার, নাহলে এর পরিণতিতে ফ্রান্স এবং গোটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জুড়ে ফ্যাসিবাদ কায়েম হবে।

এই ভয়ংকর পরিবেশ তৈরির পিছনে ফ্রান্সের অল্যান্দে সরকারের অপরাধ কিছু কম নয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ন্যাটোর শরিক হিসেবে এই সরকার পূর্বতন সারকোজি সরকারের চেয়েও কয়েকধাপ এগিয়ে সিরিয়ায় হস্তক্ষেপ করছে, ইসরায়েলের খুনি প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুকে সমর্থন জানাচ্ছে, আইভরি কোস্ট, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও মালির মতো আফ্রিকার দেশে দেশে নয়া উপনিবেশবাদী হস্তক্ষেপে মত্ত হয়েছে। আমরা বারবার বলে এসেছি, ফ্রান্সে ধর্মীয় মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামটি ‘আমাদের নিজেদের’ দেশের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ প্রতিদিন বন্য হিংসার জন্ম দেয়ার জমি তৈরি করছে।

এই উদ্দেশ্যে পিআরসিএফ ফ্যাসিবিরোধী দেশপ্রেমিক জনগণের ফ্রন্ট গড়ে তোলার ডাক দিচ্ছে, যে ফ্রন্ট সমাজ প্রগতি, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও প্রসারে এবং দুনিয়া জুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। কমিউনিস্টরা থাকবে এই লড়াইয়ের প্রথম সারিতে। নানা রঙের নানা দলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ফ্যাসিবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আসুন, আমরা প্রগতিশীল জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করি। জনগণের সংগ্রামী ঐক্য, দৃঢ়তা এবং শোষণ, দারিদ্র্য, সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা ও যুদ্ধবিহীন সমাজ গড়ে তোলা, তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্নই এই হত্যাকারীদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে দাঁড়াবে।

বিনা দ্বিধায় এইসব হত্যাকারী ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পাশাপাশি শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করা এবং ইউরোপ জুড়ে ব্যয়সংকোচের নীতির বিরুদ্ধতা করতে করতেই পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিপদমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে হবে।

(সূত্র : গণদাবী, ২৩-২৯ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা)

এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সামনে বাম মোর্চার গণঅবস্থান

গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম না বাড়ানোর দাবি

বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধির তৎপরতার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে ২০ জানুয়ারি এবং ২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত কারওয়ান বাজারস্থ বিইআরসি অফিসের সামনে গণশুনানির সময়ে গণঅবস্থান পালন করা হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, জনগণের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকার স্বেচ্ছাচারী কায়দায় ৭ম বারের মতো বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পাঁয়তারা করছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন বা পুরোনো বড় বড় প্ল্যান্টগুলোকে মেরামত ও আধুনিকায়ন করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বৃহৎ প্লান্ট স্থাপন করে সাশ্রয়ী বিদ্যুতের এই বিকল্প পথে না গিয়ে সরকার লুটপাটের উদ্দেশ্যে কুইক রেন্টাল পদ্ধতিতে সমাধানে গিয়েছে। এতে বিদ্যুৎব্যবস্থা একদিকে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং অন্যদিকে এই রেন্টাল-কুইক রেন্টালের বোঝা এখন জনগণের ঘাড়ে চেপে বসেছে। জনগণের পকেট কেটে এইভাবে সরকারের ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন কোম্পানির সুবিধা তৈরির নীতি বাস্তবায়ন করেছে সরকার।

দিনাজপুর : বিদ্যুৎ-গ্যাসের *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বাম মোর্চা
গণঅবস্থান
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
বাসদ
(মার্কসবাদী)

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি রোডমার্চ

তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় ও তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন সকল জমিতে পানির দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের উদ্যোগে ১৯ ফেব্রুয়ারি রংপুর থেকে তিস্তা ব্যারেজ অভিমুখে রোডমার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২৭ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ কর্মসূচির ঘোষণা করা হয় এবং কর্মসূচির সমর্থনে সমাবেশ, হাটসভা, পথসভা, প্রচার মিছিল, মানববন্ধন ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করা হয়।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি পুনরায় এক সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়ে বলা হয়, ‘বর্তমান সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ ধরণের কর্মসূচি পালন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরও উত্তরাঞ্চলের মরুকরণ রোধ ও কৃষি-কৃষক, প্রাণ-প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার প্রয়োজনে আমরা রোডমার্চ কর্মসূচি ঐ নির্দিষ্ট দিনে পালন করব।’ সংবাদ সম্মেলন থেকে তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা, তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন সকল চাষের জমিতে প্রয়োজনীয় পানি, গত বছর পানি না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ, পানি না থাকায় তিস্তা পাড়ের বেকার মৎস্যজীবীদের কাজ ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয় এবং রোডমার্চ সফল করতে সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর বিভাগীয় সংগঠক মঞ্জুর আলম মিঠু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, রাজশাহী বিভাগীয় সংগঠক ওবায়দুল-হ মুসা, রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, দিনাজপুর জেলা সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম সবুজ, পলাশ কান্তি নাগ প্রমুখ।

ছাত্র ফ্রন্টের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষা বাণিজ্যিকীকণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক

সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক একই পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকরণ প্রতিরোধ ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে শিক্ষার নৈতিকতা ধ্বংসের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপক শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে পালিত হল সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, গাইবান্ধা, নোয়াখালী, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, জয়পুরহাট, বগুড়া, রংপুর, যশোর সহ বিভিন্ন জেলায় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কারমাইকেল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা, র‍্যালি, ছাত্রসভা, প্রাক্তন-বর্তমানদের পুনর্মিলনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, মানববন্ধন, কর্মীসভা ইত্যাদি কর্মসূচি পালিত হয়।

এছাড়া এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ইতোপূর্বে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে গত ২৮ জানুয়ারি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ এবং জেলায় জেলায় সমাবেশ-বিক্ষোভ-মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি পালিত হয়।

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩; ই-মেইল: sammobad@spbm.org, ওয়েবসাইট : **www.sammobad.org**